স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

পরিবেশ সচেতনতা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

জানুয়ারী-২০২০

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

সহযোগিতায় ঃ এসএসডব্লিউআরডিপি-২ (জাইকা)

এলজিইডি সদর দপ্তর, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬)

শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : পরিবেশ, পরিবেশের উপাদান ও প্রকারভেদ এবং বাংলাদেশের পরিবেশ....................৩
১.১ ভূমিকা....................৩
১.২ বাস্তুসংস্থান....................৩
১.৩ খাদ্য জাল....................৪
১.৪ বাংলাদেশের পরিবেশগত অবস্থা....................৪
১.৫ ভূ-প্রকৃতি....................৫
দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশে প্রণীত পরিবেশ সম্পর্কিত আইন ও নীতিসমূহ....................৭
২.১ পরিবেশ সম্পর্কিত আইন....................৭
২.১.১ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এবং সংশোধনী....................৭
২.১.২ পানি আইন ২০১৩....................৮
২.২ বাংলাদেশে প্রণীত প্রস্তাবিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন, বিধি ও ধারাসমূহ....................৯
তৃতীয় অধ্যায় : পরিবেশগত সমস্যা/দূষণ....................১২
৩.১ বায়ু দূষণ....................১২
৩.২ পানি দূষণ....................১২
৩.৩ মাটি দূষণ....................১৪
৩.৪ শব্দ দূষণ....................১৫
৩.৫ নির্মাণ কাজের জন্য দূষণ....................১৫
চতুর্থ অধ্যায় : প্রাকৃতিক দুর্যোগ....................১৬
৪.১ ভুমিকা....................১৬
৪.২ অল্পবৃষ্টি....................১৬
৪.৩ বন্যা....................১৬
৪.৪ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস....................১৮
৪.৫ খরা....................১৮
৪.৬ ভূমিকম্প....................১৮
৪.৭ বজ্রপাত....................১৯
৪.৮ অগ্নি ঝুঁকি....................২০
পঞ্চম অধ্যায় : পরিবেশ ও পানি সম্পদ....................২১
৫.১ ভূমিকা....................২১
৫.২ পানির চাহিদা বাড়ছে....................২১
৫.৩ জমিতে পানি ব্যবস্থাপনা....................২২
৫.৩.১ সেচের পানি সাশ্রয়ের মাধ্যমে ধান উৎপাদন....................২২
৫.৩.২ **AWD (Alternative wetting and drying)** পানি সাশ্রয়ী পদ্ধতি প্রয়োগে বোরো ধান চাষ....................২২
৫.৩.৩ **AWD** তৈরি পদ্ধতি....................২২
৫.৩.৪ জমিতে **AWD** স্থাপন পদ্ধতি....................২৩
৫.৩.৫ সেচের সময় পানির পরিমাণ নির্ধারণ....................২৩
ষষ্ঠ অধ্যায় : প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত সমস্যা/ দূষণ ও সমাধান/ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা....................২৪
৬.১ এসএসডব্লিউআরডিপি - ২'র অধীন উপ-প্রকল্প সমূহের পরিবেশগত সমস্যা/ দূষণ....................২৪
৬.২ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা....................২৬
৬.৩ সুরক্ষা সরঞ্জাম....................২৭
৬.৪ পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ....................২৯
নির্মাণ পর্যায়....................২৯
অপারেশন পর্যায়....................৩৩

প্রথম অধ্যায় :

পরিবেশ, পরিবেশের উপাদান ও প্রকারভেদ এবং বাংলাদেশের পরিবেশ

১.১ ভূমিকা

পরিবেশ বলতে কোনো ব্যবস্থার ওপর বাহ্যিক প্রভাবকসমূহের সমষ্টিকে বোঝায়। যেমন ঃ চারপাশের ভৌত অবস্থা, জলবায়ু ও প্রভাব বিস্তারকারী অন্যান্য জীব ও জৈব উপাদান ইত্যাদির সামস্টিক রূপই হলো পরিবেশ। পরিবেশ প্রধানত তিন প্রকার ঃ

১। ভৌত / প্রাকৃতিক পরিবেশ

২। জৈবিক পরিবেশ

৩। সামাজিক পরিবেশ

প্রাকৃতিক পরিবেশ জড় পদার্থ (যেমন- মাটি, পানি, বাতাস, আলো ইত্যাদি) নিয়ে গঠিত। অপর দিকে বিভিন্ন জীব জগৎ (যেমন- মানুষ, পশুপাখী, গাছপালা ইত্যাদি) নিয়ে গঠিত হয়েছে জৈবিক পরিবেশ। তাছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জৈবিক পরিবেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় সৃষ্টি হয় সামাজিক পরিবেশ। পরিবেশের প্রধান তিনটি উপাদান হচ্ছে বায়ু, মাটি ও পানি। আমাদের এই পরিবেশের প্রত্যেকটি উপাদান পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের সম্পূরক রূপে কাজ করে আসছে।

১.২ বাস্তুসংস্থান

একটি নিদিষ্ট স্থানে বসবাসকারী জীবসম্প্রদায় এবং জড় উপাদানগুলোর পারস্পরিক আন্ত:ক্রিয়ার ফলে ওই স্থানে যে অনুকূল বসবাসরীতি গড়ে ওঠে তাকে বাস্তুসংস্থান বলে।

চিত্র ১ঃ জলাশয়ের বাস্তুসংস্থান

১.৩ খাদ্য জাল

একটি বাস্তুসংস্থানে অনেকগুলো খাদ্য শৃঙ্খল থাকে। বাস্তুসংস্থানের সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী কোনো না কোনো খাদ্য শৃঙ্খলের অন্তর্ভুক্ত। যেমনঃ ঈগল-সাপ, ব্যাঙ ও অন্যান্য প্রাণী খেয়ে থাকে। আবার সাপ- খরগোশ, ইঁদুর, ব্যাঙ ও অন্যান্য প্রাণী খায়। একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল একত্রিত হয়ে খাদ্য জাল তৈরি করে।

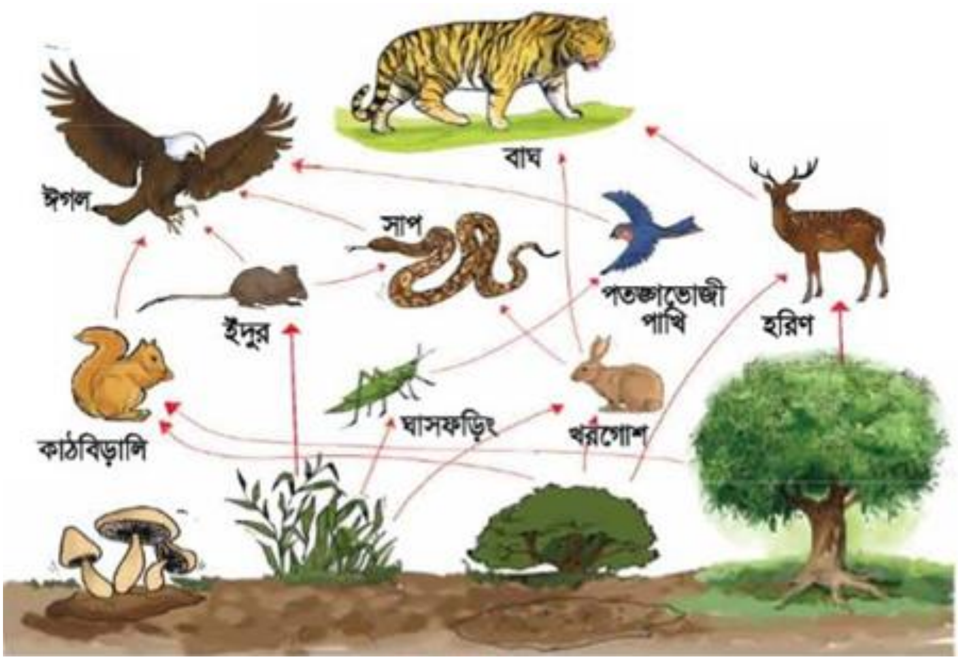

চিত্র ২ঃ খাদ্য জাল

১.৪ বাংলাদেশের পরিবেশগত অবস্থা

ব্যতিক্রম ধর্মী ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকার পানি নেমে আসে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী দিয়ে। এই পানির মাত্র শতকরা ৮ ভাগ নিষ্কাশন এলাকা বাংলাদেশের অন্তর্গত। অধিকাংশ নিষ্কাশন অববাহিকা প্রতিবেশী দেশসমূহে অবস্থিত। বিশাল প্রবাহসহ নদ-নদী সমূহের গতি বাংলাদেশ ব-দ্বীপে হ্রাস পাওয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে একটি অত্যন্ত পুরু পাললিক স্তর গঠন করে বাংলাদেশ গড়ে উঠে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পরিবেশগত দিক থেকে বাংলাদেশকে গুরুত্বপূর্ণ করেছেঃ

ক. অসংখ্য নদী, তাদের শাখা-প্রশাখা দ্বারা জালের ন্যায় বিস্তৃত বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপগুলির একটি

খ. অত্যন্ত পুরু পলি স্তর (বিশ্বে সবচেয়ে পুরু) দ্বারা গঠিত দেশটির সাধারণ ভূ-পৃষ্ঠ অত্যন্ত নিম্ন-উচ্চতা বিশিষ্ট

গ. বাংলাদেশে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন ও দীর্ঘতম বালুময় সৈকত

ঘ. বিশ্বের সর্বাধিক ঘনবসতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অত্যধিক চাপ

ঙ. আর্দ্র ও শুষ্ক মৌসুমে (বন্যা ও খরা) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির প্রাপ্যতার পরিমাণের মধ্যে ব্যাপক তারতম্য এবং

চ. বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পানির প্রবাহের ব্যাপকতা।

তিনটি বিশাল নদী পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা ভুটান, নেপাল, ভারত, বাংলাদেশ ও চীনের (তিববত) উজান থেকে পানি বয়ে নিয়ে আসে। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার নিষ্কাশন অববাহিকার মোট আয়তন প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গ কি.মি.। যার আনুমানিক ৬২% ভারতে, ১৮% চীনে, ৮% নেপালে, ৮% বাংলাদেশে ও ৪% ভুটানে অবস্থিত। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বিপুল পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয়। এ প্রবাহ কেবল দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান নদী ব্যবস্থার পর দ্বিতীয়। প্রশস্ত ও বার্ষিক প্রবাহের মোট পরিমাণ উভয় দিক থেকে পদ্মা-নিম্ন মেঘনা নদী বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম।

১.৫ ভূ-প্রকৃতি

আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে সুস্পষ্ট তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) প্লাবন সমভূমি, (খ) সোপান অঞ্চল এবং (গ) পার্বত্য অঞ্চল। এদের প্রত্যেকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

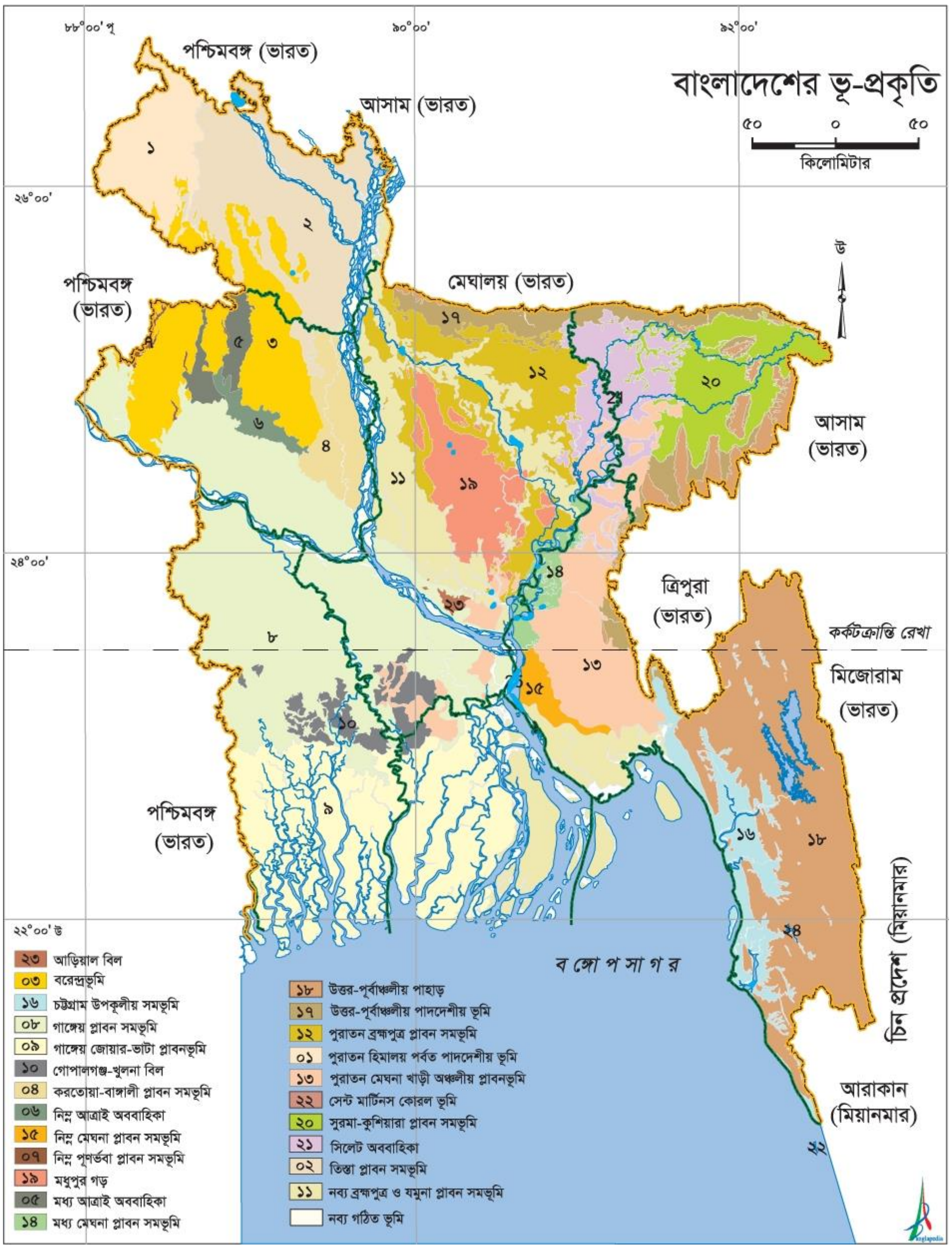

চিত্র ৩ঃ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি।

- পাহাড়সমূহ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। এসব পাহাড়ের গড় উচ্চতা ৪৫০ মিটার।

- সোপান প্রধানত মধুপুর ও বরেন্দ্র অঞ্চল, ভাওয়ালের গড় ও লালমাই-এর পাহাড়ি এলাকা নিয়ে গঠিত। বরেন্দ্র অঞ্চলের আনুমানিক আয়তন ৯,৩২০ বর্গ কি.মি.। পার্শ্ববর্তী প্লাবনভূমি থেকে এ অঞ্চলের গড় উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। মধুপুর ও ভাওয়াল ৪,১০৩ বর্গ কি.মি. এর অধিক এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। পার্শ্ববর্তী প্লাবনভূমি থেকে যার গড় উচ্চতা ৩০ মিটার। কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড়ি এলাকা ৩৪ বর্গ কি.মি. নিয়ে গঠিত এবং পার্শ্ববর্তী প্লাবনভূমি থেকে গড়ে ১৫ মিটার উঁচুতে অবস্থিত।

- নবগঠিত সমভূমি দেশের ১,২৪,২৬৬ বর্গ কিমি (৮৬%) জুড়ে বিস্তৃত।

দ্বিতীয় অধ্যায় :
বাংলাদেশে প্রণীত পরিবেশ সম্পর্কিত আইন ও নীতিসমূহ

২.১ পরিবেশ সম্পর্কিত আইন

২.১.১ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এবং সংশোধনী

বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রধান আইনি দলিল হচ্ছে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (ইসিএ '৯৫)। সামগ্রিক এই আইনে পরিবেশের সংরক্ষণ, পরিবেশ বিষয়ক মানমাত্রার উন্নয়ন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করা বিষয়ে আইনসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই আইন বলেই পরিবেশ অধিদপ্তর স্থাপিত হয়েছে এবং অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে প্রয়োজনানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে তদন্ত পরিচালনা, সম্ভাব্য দুর্ঘটনা রোধ, সরকারকে পরামর্শ প্রদান, অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন ও পরিবেশ দূষণ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করা। এই আইন অনুযায়ী (সেকশন ১২) নির্ধারিত বিধি মোতাবেক পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দেয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইসিসি) ছাড়া কোনো প্রকল্প স্থাপন করা যাবে না।

এছাড়া পরিবেশগত দূষণ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রতিরোধের জন্য বিপজ্জনক বর্জ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে, পুনঃচিহ্নিত কোনো জলাশয় ভরাট বা তাতে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তা করা যেতে পারে এবং পরিবেশ দূষণকারী কোনো বস্তুর নির্গমন যদি নির্ধারিত নির্গমন মাত্রার চেয়ে বেশি হয়, তবে নির্গমনের জন্য দায়িত্বশীলকে তা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (সেকশন ২০), ১৯৯৫ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ জারি করে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি এ বিধিমালার আওতাভুক্ত ঃ

- **পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা**

বিধি নং ৩-এ ইসিএ '৯৫-এর সেকশন ৫ অনুযায়ী 'পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) নির্ধারণের উপাদানসমূহ বর্ণিত হয়েছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে কোনো এলাকা সংকটাপন্ন হয়েছে বা সংকটাপন্ন হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে বলে প্রতীয়মান হলে, সরকারকে উক্ত এলাকাকে 'ইসিএ' ঘোষণা করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এই বিধিতে। পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকায় কোন ধরনের কার্যক্রম বা প্রক্রিয়া পরিচালনা করা যাবে অথবা শুরু করা যাবে না, তাও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়েছে এই বিধিতে। এই ক্ষমতাবলে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সুন্দরবন, কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, হাকালুকি হাওড়, টাঙ্গুঁয়ার হাওড়, মারজাত বাওড়, গুলশান-বারিধারার জলাশয়, ঢাকা শহরের চারিদিকে ০৪ টি নদীকে (বুড়িগঙ্গা নদী, শীতলক্ষ্যা নদী, তুরাগ নদী এবং বালু নদী), জাফলং-ডাউকি নদী পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা এবং এসব এলাকায় নির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

চারটি ভাগে শিল্প ও প্রকল্পের শ্রেণীকরণ

পরিবেশের উপর প্রভাব এবং স্থানের ভিত্তিতে পরিবেশ ছাড়পত্র (ইসিসি) প্রদান করার প্রয়োজনে ইসিআর'৯৭ (বিধি নং ৭)- এ প্রকল্পসমূহকে ০৪ (চার) শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ

ক) সবুজ
খ) কমলা-ক
গ) কমলা-খ এবং
ঘ) লাল।

চলমান এবং প্রস্তাবিত যেসব প্রকল্প স্বল্পমাত্রার দূষণকারী হিসেবে বিবেচিত, সেগুলোকে "সবুজ" শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সেগুলোকে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান করা হবে। কমলা-ক, কমলা-খ ও লাল শ্রেণিভুক্ত প্রকল্পসমূহকে প্রথমে একটি স্থান বিষয়ক ছাড়পত্র ও পরে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান করা হবে। ইসিআর '৯৭ এর তফশিল ১-এ উপরোক্ত ০৪ (চার) শ্রেণির শিল্পের বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

২.১.২ পানি আইন ২০১৩

পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পানি আইন ২০১৩ প্রণীত হয়।

এই আইনের ক্ষমতাবলে,

- সরকার, জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ গঠন করতে পারবেন।
- সরকার, সময়, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা পানি সম্পদ সংক্রান্ত জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন করতে পারবেন।
- এই আইনের আধীন জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা চূড়ান্ত হবার পর পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকারী বা প্রণয়নকারী বা বাস্তবায়নকারী প্রত্যেক সংস্থা বা উপযুক্ত কতৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উক্ত প্রকল্প গ্রহণ বা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে।
- পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকারী বা প্রণয়নকারী বা বাস্তবায়নকারী প্রত্যেক সংস্থা বা উপযুক্ত কতৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার পূর্বেই বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়পত্র গ্রহণ করবে।
- পানি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
    - পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা ও তার ব্যবস্থাপনা।
    - পানি সংকটাপন্ন এলাকায় পানি সম্পদের অগ্রাধিকার ব্যবহার ও অব্যাহতি।
    - ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তরের সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ ও ভূগর্ভস্থ পানি আহরণের বিধি নিষেধ।
    - জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণ।
    - বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের সুরক্ষা।
    - জলাধার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।
    - পানি অঞ্চলে বিভক্তিকরণ ও তার ব্যবস্থাপনা।
    - পানি মজুদকরনে বিধি নিষেধ।
    - বন্যা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল ঘোষণা ও তার ব্যবস্থাপনা।
    - জলাধারের সমগ্র পানি আহরনে বিধি নিষেধ এবং পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ।

২.২ বাংলাদেশে প্রণীত প্রস্তাবিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন, বিধি ও ধারাসমূহ

১. জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩

নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট নদী দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌ-পরিবহন যোগ্য হিসাবে গড়ে তোলা সহ আর্থসামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে একটি কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়।

এই আইনের ক্ষমতাবলে,

- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠিত হয়।
- কমিশনের কার্যাবলী নির্ধারিত হয় এবং
- কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়।

২. বাংলাদেশ বন্যপ্রানী আইন (প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা) ২০১২ এর মাধ্যমে অবৈধভাবে বন্য প্রাণী হরণ, শিকার, ফাঁদপাতা বা বাণিজ্য করার জন্য কারাদন্ড ও জরিমানার ক্ষমতা প্রদান করে । ফলে ১,৩০৭ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী অবৈধ কার্যক্রম থেকে রক্ষা পায়।

৩. পানি বিধিমালা ২০১৮

পানি আইন ২০১৩ ক্ষমতাবলে পানি বিধিমালা ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়। পানি বিধিমালা ২০১৮ আলোকে সুপেয় পানি এবং পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ব্যবহার্য পানির অধিকার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগীতার জন্য জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার তৈরী করা ও জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন ও হালনাগাদ করণে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় উক্ত বিধিমালায়।

পানি বিধিমালায় ২০১৮ এ বেশ কিছু পদ্ধতি আলোচনা করা হয়ঃ

- বিধিমালা প্রতিপালন ও অবৈধ স্থাপনা অপসারণ আদেশ জারির পদ্ধতি
- পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও বেআইনি কাজে ব্যবহৃত মালামাল, সরঞ্জাম বা খনন যন্ত্রপাতি আটক পদ্ধতি
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন পদ্ধতি ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রণয়ন
- ছাড়পত্র গ্রহণ পদ্ধতি (কোনো ব্যক্তি, সংস্থা, উপযুক্ত কতৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মিত যে কোনো ধরণের হাইড্রলিক অবকাঠামো নির্মাণ, নদীর তীর সংরক্ষণ, ড্রেজিং বা অনুরূপ কার্যক্রম, কর্মসূচি বা উদ্যোগ গ্রহণ করে পানি সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ, প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী হলে উক্ত ব্যক্তি, সংস্থা, উপযুক্ত কতৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে)
- পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা এবং তার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
- ভূগর্ভস্থ পানির সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
- জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল ঘোষণা পদ্ধতি

৪. মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ (সংশোধনী ১৯৯৫) এর মাধ্যমে সরকার ক্ষমতা পায় মৎস্য সম্পদ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রস্তুত ও এর প্রয়োগ করা ; নির্দিষ্ট ইঞ্জিন তৈরী ও এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা ; অস্থায়ী ও স্থায়ী বিভিন্ন প্রকার বাঁধ (weirs, dams, bunds, embankmends) নির্মাণ। এই আইন অবাধে মৎস্য শিকারে বাঁধা দেওয়ার ক্ষমতা পায়। এ ছাড়া বিষ প্রয়োগ, দূষণ বা বর্জ্য প্রয়োগেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই আইনে নির্ধারিত আছে কোন সময়ে মাছ ধরা যাবে, ডিম ছাড়ার সময় মাছ ধরা যাবে না এবং আইন ভংগকারীদের সনাক্ত করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মকর্তা নির্ধারিত রয়েছে।

৫. জাতীয় মৎস্যচাষ বিধি, ১৯৯৮ জাতীয় মৎস্যচাষ বিধির উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশগত ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সামুদ্রিক উৎস হতে মাছের উৎপাদন এবং বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন বৃদ্ধি করা (২০১৬ সালে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী মৎস্য উৎপাদনকারী ৬ টি দেশের মধ্যে অন্যতম)। এই বিধি মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে কতিপয় ঝুঁকি চিহ্নিত করেছে। যেমন: (১) জনসংখ্যা চাপ, (২) প্লাবনভূমিতে পরিকাঠামো নির্মাণ, (৩) রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারের ফলে দূষণ। নদী থেকে চিংড়ির পোনা সংগ্রহের ফলে এ জাতীয় প্রজাতি বিলুপ্ত হতে পারে এবং জীববৈচিত্র্য ও মৎস্যচাষ জীবিকায়নের উপর প্রভাব পড়ে। এই বিধি এ ধরনের অবৈধ কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করে। এটি পরোক্ষভাবে উদ্যোক্তাদের জন্য নির্দিষ্ট পোনা উৎপাদনে সমর্থন করে।

৬. বাঁধ নির্মাণ ও নিস্কাশনের সাথে জড়িত নীতিমালাকে আরও মজবুত করে নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পানি নিষ্কাশনের পথ সুগত করা এবং সেই সাথে বন্যা, ভাঙ্গন ও পানির দ্বারা অন্যান্য ক্ষতির হাত থেকে বাঁধ রক্ষা করার জন্য বাঁধ নির্মাণ ও নিষ্কাশন আইন, ১৯৫২ রয়েছে।

৭. কাজে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনার শিকার হলে তার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধনী ২০১৮) এ রয়েছে । এই আইন কারখানা শ্রমিকদের পেশাগত অধিকার ও নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় কর্মপরিবেশ ও কাজ করার যৌক্তিক পরিবেশ সম্পর্কিত।

৮. পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০

এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে বিচারিক কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ বাস্তবায়ন করা।

এই আইনের ক্ষমতাবলে,

- পরিবেশ আদালত (প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক) প্রতিষ্ঠা হয়েছে
- আদালতের আওতা এবং বিচারিক কার্যক্রমের ও আদালতের ক্ষমতার রূপরেখা, বিচারিক পরিদর্শনের প্রবেশাধিকার এবং আপিলের জন্য আপিল আদালত গঠনের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

৯. নদী রক্ষায় হাইকোর্টের রায়, ২০১৯

৩রা ফেব্রুয়ারী ২০১৯ হাইকোর্ট নদী রক্ষায় এক ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেন। এই রায়ে বেশ কিছু গুরূত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয় ঃ

- তুরাগ নদীকে ব্যক্তি আইনি সত্তা বা জীবন্ত সত্তা ঘোষণা করা
- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে দেশের সব নদ-নদীর আইনি অভিভাবক ঘোষণা করা। নদী, খাল, বিলসহ সব জলাশয় রক্ষায় যেকোনো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে সব ধরনের সংস্থাকে নদী রক্ষা কমিশনের অনাপত্তি পত্র নিতে হবে।
- দেশের সব নদী, খাল, বিল জলাশয়ের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় ও জীব বৈচিত্রের তথ্যাদি সংগ্রহ করে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌরসভার উন্মুক্ত স্থানে রাখতে হবে।
- নদী দখলকারী ব্যক্তি ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌরসভা ও জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য হবেন।
- নদী দখলকারী ব্যক্তি সরকারী বা বেসরকারী কোনো ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য হবেন।

তৃতীয় অধ্যায় :
পরিবেশগত সমস্যা/দূষণ

৩.১ বায়ু দূষণ

বায়ু দূষণের কারণ ঃ

- বাতাসে অক্সিজেন ব্যতীত অন্যান্য গ্যাস ও ধূলিকণার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বায়ু দূষিত হয়।
- পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নির্বিচারে সবুজ বৃক্ষ নিধন করার কারণে বৃক্ষ হ্রাস পাচ্ছে। তাই পরিবেশের সবটুকু CO_2 বৃক্ষরাজি শোষণ করতে পারছে না। ফলে বাতাসে CO_2 এর মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- এছাড়াও শিল্প-কারখানা, ইট ভাটার চিমনি এবং মোটরযান হতে নির্গত- ধোঁয়া, ধোঁয়াশা, বর্জ্য, এগজোস্ট গ্যাস, গ্রীন হাউস গ্যাস ইত্যাদি দ্বারা বায়ু দূষিত হচ্ছে।

ক্ষতিকর প্রভাবঃ

- মানুষের শ্বাস গ্রহণের সময় দূষিত বায়ু দেহের মধ্যে প্রবেশ করে রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে যকৃত, অগ্নাশয় ও বৃক্কে ক্রমান্বয়ে জমা হয়।
- এর ফলে বমি, মাথাব্যথা, বুকব্যথা, নাক-মুখ জ্বালা, এজমা, এলার্জি, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, মানসিক অস্থিরতা, ক্যান্সার ইত্যাদি জটিল রোগের সৃষ্টি হয়।

সমাধান ঃ

- সবুজ বৃক্ষ নিধন বন্ধ করা ও সবুজ বেষ্টনী তৈরী করা।
- শিল্প-কারখানা, ইট ভাটার চিমনি এবং মোটরযান হতে নির্গত- ধোঁয়া, ধোঁয়াশা, বর্জ্য, এগজোস্ট গ্যাস, গ্রীন হাউস গ্যাস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা।

৩.২ পানি দূষণ

পানি দূষণের কারণ ঃ

- পানি নিষ্কাশনের ড্রেনগুলো সাধারণত জলাশয়ের সাথে যুক্ত থাকার কারণে শহর, হাট-বাজার, বাসাবাড়ির ময়লা-আর্বজনা, বিভিন্ন প্রাণীর মলমূত্র, খাল, বিল ও নদীতে পড়ে পানি দূষিত হচ্ছে।
- জাহাজ ভাঙা শিল্পের বর্জ্য ও খনি হতে নির্গত রাসায়নিক পদার্থ ।
- এছাড়া ফসলের জমিতে মাত্রাতিরিক্ত বালাইনাশক ও আগাছা নাশক, হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বর্জ্য, হাওর, নদী এবং সাগরে চলাচলরত ইঞ্জিনচালিত নৌকা, লঞ্চ ও স্টিমারের তেল নিঃসরণ।

ক্ষতিকর প্রভাবঃ

- দূষিত পানি ব্যাকটেরিয়া, ক্ষুদ্র জীব, কেঁচো, সাপ, ব্যাঙ, বিভিন্ন উপকারী প্রাণী, মাছ, জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদির মৃত্যু ঘটায় ।
- বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বহনকারী ফসল এবং মাছ খেলে বন্ধ্যাত্ব, জন্মগত ত্রুটি, স্নায়ু-বৈকল্য, ক্লোন রেক্টাল, কিডনি সমস্যা, প্রষ্টেট, যকৃৎ, ফুসফুস, পাকস্থলী ক্যান্সার ও লিউকোমিয়া রোগ হয়।
- দূষিত পানি সরাসরি মানব দেহে কলেরা, টাইফয়েড, ডিসেন্ট্রি ও চর্ম রোগ ছড়ায়।
- এছাড়া আর্সেনিকযুক্ত পানি চামড়া, লিভার ও কিডনির মারাত্মক ক্ষতি করে।

সমাধান ঃ

- প্রতিটি শিল্পকারখানার সঙ্গে শোধনাগার বা ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ইটিপি) স্থাপন ।

৩.৩ মাটি দূষণ

মাটি দূষণের কারণ ঃ

- ট্যানারিসহ বিভিন্ন শিল্প কারখানার বর্জ্য, এসিড, বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য- খাল, বিল ও নদীর পানির সাথে ফসলি জমিতে ছড়িয়ে পড়ে মাটি দূষিত হচ্ছে।
- দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন- ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ইত্যাদির কারণে অবকাঠামোগুলো ধ্বংস হয়ে কৃষি জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে মাটি দূষিত হচ্ছে।

ক্ষতিকর প্রভাব ঃ

- বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বহনকারী ফসল খেলে বন্ধ্যাত্ব, জন্মগত ত্রুটি, স্নায়ু-বৈকল্য, ক্লোন রেক্টাল, কিডনি সমস্যা, প্রষ্টেট, যকৃৎ, ফুসফুস, পাকস্থলী ক্যান্সার ও লিউকোমিয়া রোগ হয়।

সমাধান ঃ

- প্রতিটি শিল্প কারখানার সঙ্গে শোধনাগার বা ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ইটিপি) স্থাপন।

৩.৪ শব্দ দূষণ

শব্দ দূষণের কারণ ঃ

- বাস-ট্রাক, রেলগাড়ি, লঞ্চ-স্টিমারের হাইড্রোলিক হর্নের শব্দ, বিমানের বিকট শব্দ, শিল্প কারখানার শব্দ, ইট-পাথর ভাঙার শব্দ, মাইকের শব্দ, পটকার শব্দ, হাট বাজার, যানজট, জনসভায় মানুষের কোলাহলের শব্দ, ঢাক-ঢোলের শব্দ, শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ।

ক্ষতিকর প্রভাব ঃ

- শব্দ দূষণের কারণে শ্রবণশক্তি হ্রাস, মাথাব্যথা, হৃদরোগ, স্নায়ুবিক বৈকল্য, শিশুর মানসিক বিপর্যয়, অনিদ্রা, বিরক্তিভাব, মনোযোগ নষ্ট ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

সমাধান ঃ

- যানবাহনে হাইড্রোলিক হর্নের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

৩.৫ নির্মাণ কাজের জন্য দূষণ

বায়ু দূষণ ঃ এ কাজের ফলে উৎপন্ন ধূলা শস্য এবং গবাদি পশুর উপর প্রভাব ফেলবে। নির্মাণের সময় উৎপন্ন ধূলার পরিমান যতদূর সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যেখান থেকে মাটি সরানো হয় এবং খনন করা হয় সে স্থান গুলোতে যথাযথভাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।

শব্দ দূষণ ঃ যানবাহনের চলাচল, খনন মেশিনারী, concrete মেশানো এবং অন্যান্য নির্মাণ কাজের জন্য শব্দ উৎপন্ন হয়। নির্মাণের সময় শব্দের মাত্রা স্বাভাবিক মানদন্ড অতিক্রম করে। বিদ্যালয়, ধর্মীয় জায়গা এবং জনাকীর্ণ মার্কেটে মাত্রাতিরিক্ত শব্দ ক্ষতির কারণ হতে পারে।

পানি দূষণ ঃ নির্মান পর্যায়ে, মাটি উত্তোলন স্থানীয়ভাবে পানির স্বচ্ছতা ক্ষতিগ্রস্ত করবে। সাময়িক এবং স্থানীয় প্রকৃতির কারণে এই ক্ষতি বৃদ্ধি পানির গুনের উপর কোন প্রভাব ফেলে না।

মাটি দূষণ ঃ নির্মাণ এলাকা এবং এর আশেপাশের এলাকার কৃষিজমির মাটি নির্মাণ কাজ দ্বারা দূষিত হবার প্রবণতা থাকে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ
প্রাকৃতিক দুর্যোগ

৪.১ ভুমিকা

ভৌগলিক অবস্থান, ভূতাত্ত্বিক গঠন ও জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্যোগ প্রবণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে সাধারণত অম্লবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছাস, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে।

৪.২ অম্লবৃষ্টি

বায়ুমন্ডলে উপস্থিত সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুপ্রবাহ দ্বারা তাড়িত হয়ে বাতাসের পানি বাষ্পের সাথে মিশে সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড এবং কার্বনিক এসিড রূপে বৃষ্টির পানির সাথে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। ঐ পানির পিএইচ মান ৫.৬ এর কম হলেই বিষয়টিকে অম্লবৃষ্টি বা এসিড রেইন বলা হয়। অম্লবৃষ্টির ফলে ঃ

- নদী, খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদি জলাশয়ের পানি অম্লধর্মী হয়ে জলজ বাস্তুস্তরের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।
- মাছ, শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ এবং পানিতে বসবাসরত বিভিন্ন অনুজীব মরে যায়।
- মাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- অম্লবৃষ্টি গাছপালার সবুজ পাতা বিনষ্ট করে প্রাকৃতিক বন ধ্বংস করে এবং মাটির সাথে মিশে উপকারী ব্যাকটেরিয়া ও কেঁচো মেরে ফেলে।
- সবুজ পাতার পচন ক্রিয়া দ্বারা মাটিতে হিউমাস সরবরাহ প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- অম্লবৃষ্টির ঘটনা সর্বপ্রথম ১৮০০ সালে ইংল্যান্ডে হয়েছিল।

৪.৩ বন্যা

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ছোট বড় প্রায় ২৩০ টি নদী বয়ে গেছে। মূলত এজন্যই অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের তুলনায় বাংলাদেশে বন্যার প্রকোপ বেশি। বাংলাদেশের বন্যার কারণ হিসাবে নিম্নের তিনটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

ক. প্রধান নদ/নদী এবং উহার শাখা সমূহ পলি মাটি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়া।

খ. পানি চলাচল পথে অপরিকল্পিত রাস্তা-ঘাট, বাঁধ, দালান-কোঠা ইত্যাদি নির্মিত হওয়ায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়া।

গ. ভূমন্ডলীয় তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে হিমালয় থেকে অতিরিক্ত বরফ গলে পানি আকারে নীচে নেমে আসা এবং বঙ্গোপসাগরের পানি ফুলে-ফেঁপে উচচতা বৃদ্ধি পাওয়ায় নদীর পানি সাগরে নামতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

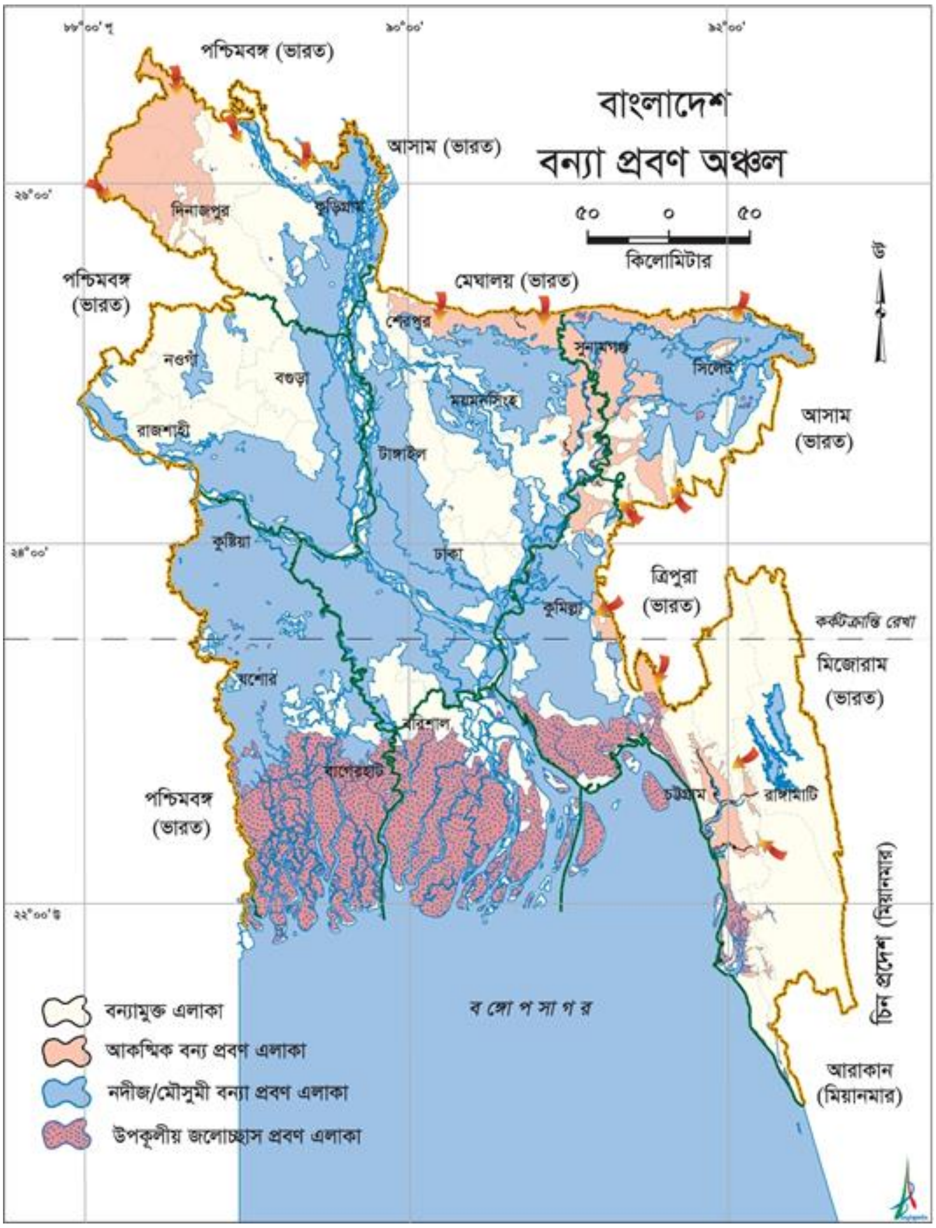

চিত্র ৪ ঃ বন্যা প্রবণ এলাকা।

বাংলাদেশে ০৩ (তিন) ধরনের বন্যা দেখা যায় ঃ

- আকস্মিক বন্যা হয়ে থাকে উজানে, ভারি বৃষ্টিপাত থেকে যা নদীকে প্লাবিত করে।
- মৌসুমি বন্যা সৃষ্টি হয় ভারি অবিরাম বৃষ্টিপাত থেকে আবদ্ধ বা নিম্নমানের নিষ্কাশনসম্পন্ন স্থানে যেখানে পানি চুয়ানো অপেক্ষা বৃষ্টিপাতের পরিমান অধিক। এ ধরনের বন্যা বার্ষিক এবং প্রত্যাশিত ঘটনা যার উপর দেশের কৃষি জমির ক্ষয়পূরণ এবং জলজ পরিবেশের ধান ও পাট চাষের প্রয়োজনীয় পানির জন্য ঐতিহ্যগতভাবে নির্ভর করে।
- ঘূর্ণিঝড় জনিত বন্যা বিভিন্ন ধরনের বন্যার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক। এসব বন্যা ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটাতে পারে এবং প্রধানত উপকূল অঞ্চলে দেখা যায়।

৪.৪ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস

বন্যার ন্যায় ঘর্ণিঝড়ও বাংলাদেশের জন্য একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা। উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সাথে জলোচ্ছাসও দেখা দেয়। ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছাসের সময় সমুদ্র উপকূল এবং আশেপাশের এলাকায় বৃক্ষরাজি, মানুষ, বন্যপ্রাণী এবং গবাদিপশুর যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। যথা ঃ

- বাতাসের গতিবেগ কখনও কখনও ঘন্টায় ২০০ কিলোমিটারের উর্দ্ধে এবং
- জোয়ারের পানির উচ্চতা স্বাভাবিকের চাইতে প্রায় ৪ মিটার পর্যন্ত বেশী হয়।

৪.৫ খরা

এসব দুর্যোগের বাইরেও বাংলাদেশে মাঝে মধ্যে খরা দেখা দেয়। খরার সময়ে-

- শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে
- মাটির আর্দ্রতা থাকে না ও বৃষ্টিপাত হয় না
- ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যায় এবং
- সেচযোগ্য কৃষিকাজ এবং উৎপাদন মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হয়।

৪.৬ ভূমিকম্প

বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীর মতে প্রাকৃতগতভাবে ভূ -অভ্যন্তরস্থ বিশালাকৃতির চলমান কঠিন শিলাস্তর (ট্যাকটোনিক প্লেট) এর সঞ্চালনে পারস্পরিক ধাক্কা থেকেই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। ভূমিকম্পের ফলে কখনও কখনও পর্বতমালা, উপত্যকা, আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি। আবার কখনও কখনও হ্রদ, সাগর, মহাসাগর ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, ভূ -অভ্যন্তরস্থ বিশালাকৃতির উত্তর-পূর্ব দিকে চলমান ইন্ডিয়ান প্লেট এবং স্থির ইউরেশিয়ান প্লেটের ধাক্কার ফলে হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান প্লেটটি প্রতি বৎসর ৫ সেন্টিমিটার করে উত্তর-পূর্ব দিকে সরে আসছে। এভাবে যখনই ইন্ডিয়ান প্লেট এবং ইউরেশিয়ান প্লেট দুইটি কোন স্থানে মিলিত হচ্ছে তখনই অত্র এলাকায় ভূকম্পন অনুভূত হচ্ছে। লক্ষ্য করা গেছে যে, এই ক্রিয়ার ফলেই এভারেষ্ট পর্বত শৃঙ্গের উচ্চতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ট্যাকটোনিক প্লেটের ক্রিয়া ছাড়াও ভূগর্ভ থেকে অত্যধিক পরিমানে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ অথবা অন্য কোন কারণে ভূ-গর্ভে সৃষ্ট ফাঁকা স্থান পতনে ভূমিধ্বস ইত্যাদি বিষয়াবলীও ভূমিকম্পের কারণ হতে পারে।

অনুমান করা হয় যে, ১৭৬২ সালের ভূমিকম্পে মধুপুরের গড় ও সিলেটের হাওড় এলাকার সৃষ্টি হয়। আরও ধারণা করা হয় যে, ১৭৮৭ ও ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে যথাক্রমে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। ভূতাত্ত্বিকেরা বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে যথা ঃ রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার অংশ বিশেষকে ভূকম্পনের দিক থেকে মারাত্মক সক্রিয় এলাকা রূপে চিহ্নিত করেছেন।

ভূমিকম্পের সময় নিরাপদ থাকতে যে সব বিষয় মাথায় রাখা দরকার ঃ

- বিম কিংবা পিলারের নিচে, মজবুত আসবাবপত্রের পাশে/নিচে অথবা দেয়ালের কোণে অবস্থান নেওয়া।
- ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি না থামা পর্যন্ত দু'হাত অথবা বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা।

- কাঁচের জানালা ও অনিরাপদ আসবাবপত্র (যা গায়ের উপর পড়ে আঘাত লাগতে পারে) থেকে দূরে থাকা।
- শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করা।
- ভূমিকম্প হচ্ছে টের পেলে দ্রুত গ্যাসের চুলা/গ্যাসের লাইন বন্ধ করে দেওয়া - যাতে অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি না থাকে।
- আতঙ্কিত হয়ে ছুটোছুটি না করে শান্ত থাকা।
- সম্ভব হলে দ্রুত বাড়ির বাইরে গিয়ে খোলা জায়গায় অবস্থান নেওয়া।
- অগ্নিকান্ড এড়াতে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবার সময় বিদ্যুতের মেইন সুইচ দ্রুত বন্ধ করে দেওয়া।
- বহুতল ভবন থেকে নেমে আসার ক্ষেত্রে লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি ব্যবহার করা।
- বের হবার পর উঁচু ভবন, বড় গাছ, টিলা ও বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে দ্রুত খোলা ও নিরাপদ স্থানে অবস্থান নেওয়া।
- গাড়ি চালানো অবস্থায় ভূমিকম্প হলে গাড়ি থামিয়ে দেওয়া ; ভূমিকম্প না থামা পর্যন্ত গাড়ি থেকে বের না হওয়া।

৪.৭ বজ্রপাত

জলীয় বাস্প ঘনীভুত হয়ে মেঘে পরিণত হওয়ার সময় এতে প্রচুর স্থির বৈদ্যুতিক চার্জ জমা হয়। ফলে বাতাসের মধ্য দিয়ে স্পার্ক আকারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এ ঘটনাই হল বজ্রপাত। বাংলাদেশে মার্চ থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রতি বছর বজ্রপাতে গড়ে দুই থেকে তিনশ মানুষের প্রাণহানী ঘটে।

বজ্রপাতের সময় নিরাপদ থাকতে যে সব বিষয় মাথায় রাখা দরকার ঃ

ক. ঘন ঘন বজ্রপাত হতে থাকলে খোলা বা উঁচু জায়গায় না থেকে কোনো দালানের নিচে আশ্রয় নেওয়া।

খ. বজ্রপাত হলে উঁচু গাছপালা বা বিদ্যুতের খুঁটিতে বিদ্যুৎ স্পর্শের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই বজ্রপাতের সময় গাছ বা খুঁটির কাছাকাছি থাকা নিরাপদ নয়। ফাঁকা জায়গায় যাত্রী ছাউনি বা বড় গাছে বজ্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অত্যন্ত বেশি।

গ. বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার পাশে না থেকে জানালা বন্ধ করে রাখতে হবে।

ঘ. বজ্রপাতের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির রেলিং, পাইপ ইত্যাদি এমনকি ফোনও ব্যবহার করা যাবে না।

ঙ. বজ্রপাতের সময় বৈদ্যুতিক সব ধরণের যন্ত্রপাতি ধরা যাবে না।

চ. বজ্রপাতের সময় রাস্তায় গাড়িতে থাকলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িতে ফেরার চেষ্টা করা, সম্ভব না হলে গাড়ি কোনো পাকা ছাউনির নিচে রাখতে হবে। এই সময় গাড়ির কাচে হাত দেওয়াও বিপদজনক।

৪.৮ অগ্নি ঝুঁকি

অগ্নি ঝুঁকি প্রতিরোধে যে সব বিষয় মাথায় রাখা দরকার ঃ

- রান্নার পর চুলা সম্পূর্ণভাবে নিভিয়ে ফেলা।
- ভেজা জামা কাপড় চুলার উপর শুকাতে না দেওয়া।
- গ্যাসের চুলা জ্বালানোর পূর্বে কমপক্ষে ১৫ মিনিট পূর্বে রান্নাঘরের সকল জানালা/ দরজা খুলে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা।
- বাসাবাড়ির বৈদ্যুতিক লাইন প্রতি ০৬ মাস পর পর নিয়মিত পরীক্ষা করা।
- সঠিক মানের বৈদ্যুতিক তার/সরঞ্জাম ব্যবহার করা।
- অগ্নি ঝুঁকি অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র মজুদ রাখা।
- অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রের প্রয়োগ ও ব্যবহার বিধি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নেওয়া।

অগ্নি নির্বাপণে করণীয়ঃ

- বিলম্ব না করে নিকটস্থ ফায়ার স্টেশনে সংবাদ দেওয়া, অথবা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে (০২-৯৫৫৫৫৫৫/০১৭৩০৩৩৬৬৯৯) অবহিত করা।
- প্রথমেই আগুন নিভানোর চেষ্টা করা।
- বহন যোগ্য অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করা।
- গায়ে বা পরনের কাপড়ে আগুন ধরলে মাটিতে গড়াগড়ি করা।

পঞ্চম অধ্যায় :
পরিবেশ ও পানি সম্পদ

৫.১ ভূমিকা

পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ পানির মধ্যে ব্যবহারযোগ্য পানি অর্থাৎ পানীয়, কৃষিকাজ, গৃহস্থালি বা অন্যান্য কাজের জন্য কতটা পানি লাগে ও লবণাক্ত পানি কতটা তার কথা বলতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, মোট পানির শতকরা সাড়ে সাতানব্বই ভাগ (৯৭.৫%) পানি লবনাক্ত আর শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫%) পানি ব্যবহার যোগ্য। তার মধ্যে আবার সাড়ে চুয়াত্তোর ভাগ (৭৪.৫%) পানি রয়েছে বরফে ঢাকা ও তুষার শৃঙ্গে আটকে আছে। আর মাত্র শতকরা শূন্য তিন ভাগ (০.৩%) পানি পাওয়া যায় নদীতে, জলাশয়, পুকুরে, বাঁধে বা ঝিলে এবং শতকরা মাত্র এক ভাগ (১%) পানি মাটির নীচে আটকে আছে।

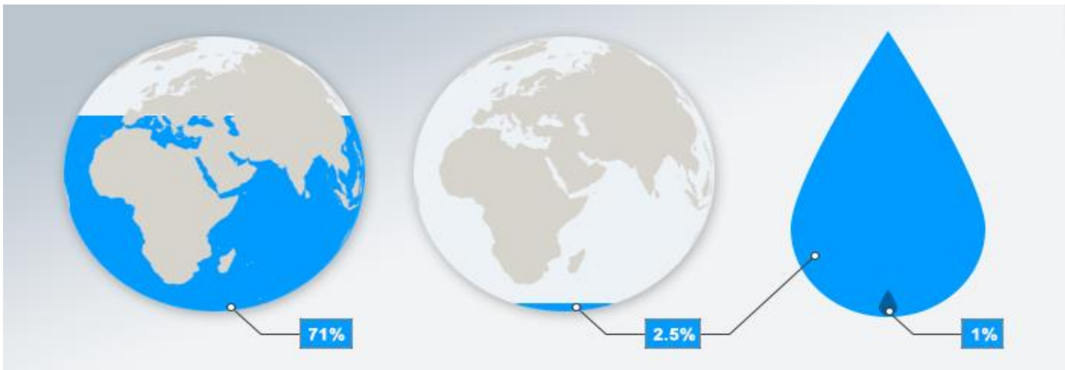

সাধারণভাবে পানি আমরা গৃহস্থালী- যেমন পানীয়, রান্না, স্নান, শৌচ কাজ, জামা কাপড় ধোয়া, বাসনপত্র ধোয়া, গৃহপালিত জীবজন্তু প্রতিপালন, কৃষিকাজ ও কল-কারখানার কাজে ব্যবহার করি। দেখা যাচ্ছে কৃষিকাজে, খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য কমপক্ষে শতকরা আশিভাগ (৮০%) পানি, কল-কারখানা ও তাপ বিদ্যুত কেন্দ্রের জন্য শতকরা দশ ভাগ (১০%) পানি, পানীয় হিসেবে শতকরা পাঁচ ভাগ (৫%) পানি ও বাকিটা অন্যান্য বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

৫.২ পানির চাহিদা বাড়ছে

পানি ব্যবস্থাপনা যতই আধুনিক ও সুকৌশলী হোক না কেন, পানির চাহিদা যেভাবে বেড়ে চলেছে, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা সেই ব্যবস্থাপনার নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী রান্না-বান্না ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রতিটি মানুষের দিনে ২০ লিটার বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজন। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে পানির ব্যবহার এর চাইতে অনেক বেশি। জার্মানিতে একজন নাগরিক দিনে গড়ে ১৪০ লিটার পানি খরচ করে থাকেন, তার মধ্যে ৩০ লিটার যায় টয়লেট ফ্লাশ করতে।

বাংলাদেশে মোট পানি সম্পদের পরিমাণ ১,২১০.৬ বিলিয়ন ঘনমিটার বলে অনুমান করা হয়েছে। যার ২১.১ বিলিয়ন ঘনমিটার ভূ-গর্ভস্থ পানি এবং ১,১৮৯.৫ বিলিয়ন ঘনমিটার ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি। মোট ব্যবহৃত পানির ৯০% ই ব্যবহার করা হয় কৃষি খাতে। যার ৮০% আসে ভূ-গর্ভস্থ উৎস হতে এবং সেচের কাজে ব্যবহৃত পানির প্রায় ৮৮% আসে ভূ-গর্ভস্থ উৎস হতে। বর্ষা মৌসুমে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি শোষণের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পুনঃভরণ হয়ে যায়।

৫.৩ জমিতে পানি ব্যবস্থাপনা

৫.৩.১ সেচের পানি সাশ্রয়ের মাধ্যমে ধান উৎপাদন

ধান চাষে সর্বদা দাঁড়ানো পানির প্রয়োজন নেই। ধান ক্ষেতে একবার ৫ থেকে ৭ সেঃ মিঃ সেচ দেয়ার পর জমিতে দাঁড়ানো পানি শেষ হবার ৩ দিন পর পুনরায় সেচ দিলে ২৫% পানির অপচয় রোধ করা যায়।

৫.৩.২ AWD (Alternative wetting and drying) পানি সাশ্রয়ী পদ্ধতি প্রয়োগে বোরো ধান চাষ

AWD পদ্ধতির মূল বিষয় হলো ধান চাষের ক্ষেত্রে জমিতে সার্বক্ষনিকভাবে পানি না রেখে পর্যায়ক্রমে জমি ভেজা ও শুষ্ক পদ্ধতি অনুসরণ করা। জমির পর্যায়ক্রমে ভেজা ও শুষ্ক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হয়। ধান চাষে একবার সেচ দিয়ে পরবর্তী সেচের সঠিক সময় নির্ধারনের জন্য জমিতে ছিদ্রযুক্ত পিভিসি পাইপ (পর্যবেক্ষণ নল) বসাতে হয়। এ পাইপে পরবর্তী নির্দিষ্ট লেভেলে পানি নেমে গেলে সেচ দিতে হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে জমিতে সেচ প্রদান করতে হয়।

এই পদ্ধতিতে কৃষকের প্রচলিত সেচ পদ্ধতির চেয়ে ৩৭ শতাংশ কম সেচের পানি ব্যবহৃত হয়েছে এবং ১২% বেশী ফলন পাওয়া গেছে। একইভাবে ব্রি এর ফলাফলে দেখা গেছে এ পদ্ধতিতে ৩০% কম সেচের পানি প্রয়োগ হয়েছে এবং ২৯% কম ডিজেল ব্যবহৃত হয়েছে।

৫.৩.৩ AWD তৈরি পদ্ধতি

এটি আমরা নিজে নিজেই তৈরি করতে পারি। প্লাষ্টিকের পিভিসি পাইপ বা বাঁশের চোঙ্গা ও প্লাষ্টিকের বোতল দিয়ে এটি তৈরি করা যায়। এটি তৈরি করতে হলে পাইপ বা বোতল বা বাঁশের ব্যাস ৭-১০ সে:মি: এবং ৩০ সে:মি: লম্বা হতে হবে। পাইপ বা বোতল বা বাঁশের নিচের দিকের ২০ সে:মি: ছিদ্রযুক্ত এবং উপরের দিকে ১০ সে:মি: ছিদ্রবিহীন রাখতে হবে। যে দিকে ছিদ্র থাকবে সে দিকে পাইপ বা বাঁশের গায়ে ৫ সে:মি: পর পর ৩ সূতি ব্যাসের ড্রিল বিট দিয়ে ছিদ্র করতে হবে। এ ছিদ্র ড্রিল মেশিন বা ছিদ্র করার মত যে কোন যন্ত্র দিয়ে করা যেতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে পাইপ বা বাঁশে কোন ফাঁটল না হয়। এক সারি থেকে অন্য সারির ছিদ্রের দূরত্ব হবে ৫ সে:মি:।

৫.৩.৪ জমিতে AWD স্থাপন পদ্ধতি

তৈরি করা পাইপ এমন সুবিধাজনক স্থানে স্থাপন করতে হবে, যেন স্থানটি সমস্ত প্লটের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এবং সহজে এর ভিতরের পানির মাত্রা মাপা যায়। জমিতে পাইপটির ছিদ্রযুক্ত অংশ মাটির নীচে এবং ছিদ্রবিহীন অংশ মাটির উপরে থাকতে হবে। পাইপটি খাড়াভাবে স্থাপন করতে হবে এবং এর ভিতরের মাটি চামচ দিয়ে বের করে ফেলতে হবে। যাতে মাটির ভিতরের পানি ছিদ্র দিয়ে সহজে প্রবেশ করতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে পানির ভাসমান খড়খুটা ভিতরে ঢুকতে না পারে। এক একর ধান ক্ষেতে ২/৩ জায়গায় স্থাপন করা যেতে পারে।

৫.৩.৫ সেচের সময় পানির পরিমাণ নির্ধারণ

ক. ধানের চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর্যন্ত জমিতে ২-৪ সে:মি: পানি রাখতে হয়। এর পর থেকে AWD পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে হবে।

খ. জমিতে সেচ আরম্ভ করার পর প্রতিবার এমন পানি দিতে হবে যাতে জমির ৫ সে:মি: গভীরতায় পানি থাকে। জমির পানি শুকানোর পর পাইপের ভিতর পানির মাত্রা মাপতে হবে। পাইপের ভিতরে পানির স্তর যদি জমির লেভেল থেকে ১৫ সে:মি: নিচে নেমে যায় (অর্থাৎ পাইপের তলার মাটি দেখা যাবে) তখন সেচ দিতে হবে। এ অবস্থায় আসতে প্রায় ৫-৮ দিন সময় লাগে। এইরকমভাবে ফুল না আসা পর্যন্ত সেচ দিতে হবে।

গ. ফুল আসার পর থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত ২ সপ্তাহ জমিতে অবশ্যই ২-৪ সে:মি: দাঁড়ানো পানি রাখতে হবে।

ধানের জমিতে কোন ভাবেই আগাছা জন্মাতে দেওয়া যাবে না। AWD ব্যবহারের ফলে যদি আগাছার উপদ্রব দেখা দেয় তাহলে আগাছা দমনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় :
প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত সমস্যা/ দূষণ ও সমাধান/ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৬.১ এসএসডব্লিউআরডিপি - ২'র অধীন উপ-প্রকল্প সমূহের পরিবেশগত সমস্যা/ দূষণ

ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট এবং রংপুর বিভাগের ২৯টি জেলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকার ভোগীদের অংশগ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে ২৯০টি বন্যা নিয়ন্ত্রন, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও আওতাধীন এলাকা উন্নয়ন সংক্রান্ত উপ-প্রকল্পের পুর্নবাসন এবং উন্নয়ন করা।

কার্যক্রম	সম্ভাব্য উপকার	সম্ভাব্য ক্ষতি
• বাঁধ নির্মাণ	• বন্যার পরিমাণ হ্রাস	• প্রাকৃতিক মৎস্য হ্রাস
• বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও সংস্করণ	• বন্যার স্থায়ীত্ব কমানো	• জলাভূমির আয়তন ও জলজ বসতি হ্রাস; নৌপথ ও চালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি
• খাল খনন	• বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা	• জমির লোকসান
• খাল পুনঃখনন	• আগাম নিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ	• জমির লোকসান

কার্যক্রম	সম্ভাব্য উপকার	সম্ভাব্য ক্ষতি
• স্লুইস গেট নির্মাণ	• ভূপরিস্থিত পানির প্রাপ্যতা	• জমির উর্বরতা হ্রাস
• পানি ধারণক্ষম কাঠামো নির্মাণ	• কর্মসংস্থানের সুযোগ	• স্থলজ ও বন্য প্রাণী হ্রাস
• অন্যান্য কার্যাবলী যেমন-পাম্প স্থাপন, পাকা ড্রেন নির্মাণ, কালভার্ট বসানো, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি	• কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণ • সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন	• পতঙ্গ বাহিত রোগের প্রকোপ • আকস্মিক বিপদ ও ঝুঁকি

৬.২ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

(পরিবেশের) উপাদান	সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ	প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা/ প্রশমন পদক্ষেপসমূহ	দায়িত্ব
ভূমি ও মৃত্তিকাগত পরিবেশ	ক্ষতিকারক দ্রব্য ও রাসায়নিকের (দ্রব্য) ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহারের ফলে মৃত্তিকা দূষণ।	• জৈবিক, প্লাস্টিকজাত, কাঁচ ও অন্যান্য বর্জ্য পৃথকভাবে সংগ্রহ করার জন্যে বিভিন্ন স্থানে উন্নত ও টেকসই ডাস্টবিন স্থাপন করা উচিত। • পৃথকীকরণ বিধিমালা অনুযায়ী বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে সকল কর্মীদের নির্দেশনা প্রদান করা।	ঠিকাদার
পানিসম্পদ ও এর গুনাগুণ	ক্যাম্পের গৃহস্থালী, বর্জ্য নদীতে ফেলা।	• নির্ধারিত স্থানে বর্জ্য ফেলতে হবে।	ঠিকাদার
বায়ু	নির্মাণ স্থান হতে ধূলি উৎক্ষেপণ।	• পানি ছিটানো।	ঠিকাদার
পারিপার্শ্বিক শব্দের মান (শব্দ দূষণ)	যন্ত্রপাতি (মেশিন) হতে সৃষ্ট শব্দ দূষণ ।	• পেশাগত ঝুঁকির প্রকোপ হ্রাসে উচ্চশব্দ সম্বলিত স্থানে কর্মরত সকল ব্যক্তিকে ইয়ার প্লাগ / ইয়ার মাফ্স প্রদান করা।	ঠিকাদার
বাস্তুসংস্থান	(জীবকূলের) আবাসে পরিবর্তন।	• উদ্ভিদকূলের হ্রাসের ক্ষতিপূরণে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নতি সাধনে প্রকল্পের সীমানা বরাবর সবুজ বেষ্টনী স্থাপন করা। • মাটির ক্ষয় রোধে, যে সকল খোলা স্থানে বৃক্ষ রোপণ করা সম্ভব হবে না, সে সকল স্থানে গুল্ম ও ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ দ্বারা আবৃত করার প্রচেষ্টা করা।	ঠিকাদার
পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা	দুর্ঘটনা ঝুঁকির কারনে কর্মীদের দুর্ভোগ।	• পিপিই সরবরাহ করা এবং ব্যবহার করতে নিশ্চিত করা।	ঠিকাদার

৬.৩ সুরক্ষা সরঞ্জাম

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>এয়ার প্লাগ</td><td>এয়ার মাফ্স</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">সুরক্ষা জুতা</td></tr>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td>সুরক্ষা মোজা</td><td>সুরক্ষা মুখোশ</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>রিফ্লেক্টিং জ্যাকেট</td><td>হেলমেট</td></tr>
</table>

৬.৪ পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ

নির্মাণ পর্যায়

১. পরিবেশ দূষণ-বায়ু, পানি, শব্দ এবং মাটি (যখন আইইই / ইআইএ গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ দূষণ সনাক্ত করে, পরীক্ষা কেবল প্রাসঙ্গিক আইটেমের জন্য করা উচিত)।

ক) বায়ু মানের পরীক্ষা

পরীক্ষার তারিখ:

সাইট / অবস্থানের নাম:

পরীক্ষার ফলাফল:

প্যারামিটার	একক	সর্বাধিক ঘনত্ব				বাংলাদেশের জাতীয় বায়ু মানমাত্রা	গড় সময়
		স্থান ১	স্থান ২	স্থান ৩	স্থান ৪		
কার্বন মনোক্সাইড (CO)	পিপিএম					৩৫ পিপিএম	১ ঘন্টা
সালফার - ডাই - অক্সাইড (SO_2)	মিলিগ্রাম/ ঘনমিটার					৩৬৫ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার	২৪ ঘন্টা
নাইট্রোজেনের অক্সাইড সমূহ (NO_X)	মিলিগ্রাম/ ঘনমিটার					১০০মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার	বার্ষিক
পি.এম$_{১০}$	মিলিগ্রাম/ ঘনমিটার					১৫০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার	২৪ ঘন্টা

খ) শব্দ স্তর পর্যবেক্ষণ

পরীক্ষার তারিখ:

সাইট / অবস্থানের নাম:

পরীক্ষার ফলাফল:

dBa এককে ধার্যকৃত সীমা		**বাংলাদেশের জাতীয় শব্দের মানমাত্রা (মিশ্র এলাকা)**	
দিন	**রাত**	**দিন**	**রাত**
		৬০	৫০

গ) ভূ-পৃষ্ঠ পানির মানমাত্রা

পরীক্ষার তারিখ:

সাইট / অবস্থানের নাম:

পরীক্ষার ফলাফল:

প্যারামিটার	**একক**	**সর্বাধিক ঘনত্ব**				**বাংলাদেশের জাতীয় ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির মানমাত্রা**
		স্থান ১	**স্থান ২**	**স্থান ৩**	**স্থান ৪**	
pH						৬.৫-৮.৫
ডিও (দ্রবীভূত অক্সিজেন)	মিঃগ্রাঃ/লিঃ					≥ ৫
বিওডি (বায়ো কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড)	মিঃগ্রাঃ/ লি ঃ					≤ ১০
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	মিঃগ্রাঃ/ লি ঃ					১০

ঘ) ভূগর্ভস্থ পানির মানমাত্রা

পরীক্ষার তারিখ:

সাইট / অবস্থানের নাম:

পরীক্ষার ফলাফল:

প্যারামিটার	একক	সর্বাধিক ঘনত্ব				বাংলাদেশের জাতীয় ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির মানমাত্রা
		স্থান ১	স্থান ২	স্থান ৩	স্থান ৪	
pH						৬.৫-৮.৫
টারবিডিটি	জেটিইউ					১০
খরতা	মিঃগ্রাঃ/ লি ঃ					২০০-৫০০
লৌহ	মিঃগ্রাঃ/ লি ঃ					০.৩-১.০
নাইট্রেট	মিঃগ্রাঃ/ লি ঃ					১০
আর্সেনিক	মিঃগ্রাঃ/ লি ঃ					০.০৫
কলিফর্ম (সার্বিক)	সংখ্যা/ ১০০ মিলি.					০

ঙ) মাটির মানমাত্রা

পরীক্ষার তারিখ:

সাইট / অবস্থানের নাম:

পরীক্ষার ফলাফল:

প্যারামিটার	একক	সর্বাধিক			
		স্থান ১	স্থান ২	স্থান ৩	স্থান ৪
pH					
আর্দ্রতা	%				
আয়রন	কেজি/ হেক্টর				
সোডিয়াম	কেজি/ হেক্টর				
পটাশিয়াম	কেজি/ হেক্টর				
টোটাল নাইট্রোজেন	কেজি/ হেক্টর				

২. শ্রম ও কর্মস্থলের অবস্থা

ক) শ্রমিকের নিরাপত্তা এবং কাজের পরিবেশ

সাইট পরিদর্শন তারিখ:

সমস্যা এবং প্রশমন ব্যবস্থা:

বিষয়	পর্যবেক্ষণ	প্রস্তাবনা
সুরক্ষা সরঞ্জাম		
ক্যাম্প / বিশ্রামের সুবিধা		
প্রাথমিক চিকিৎসা		
মহিলা শ্রমিকদের জন্য সুবিধা		
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা		
পানি সরবরাহ		
টয়লেট সুবিধা		

খ) রিপোর্টিং সময়কালে যে কোন দুর্ঘটনার বিবরণ এবং গৃহীত ব্যবস্থা

তারিখ	দুর্ঘটনার বিবরণ	গৃহীত ব্যবস্থা

৩. বাস্তুসংস্থান এবং জীববৈচিত্র

সাইট পরিদর্শন তারিখ:

সাইটের বিবরণ:

সমস্যা এবং প্রশমন ব্যবস্থা:

বিষয়	সমস্যা	প্রশমন ব্যবস্থা
বন এবং প্রাকৃতিক উদ্ভিদের উপর প্রভাব		
বন্য জীবনের উপর প্রভাব		
জলজ প্রাণীর উপর প্রভাব		
গৃহপালিত পশুর উপর প্রভাব		

গাছ কাটা / গাছ লাগানো:

অবস্থান	গাছ কাটার সংখ্যা	রোপণ করা চারা সংখ্যা

অপারেশন পর্যায়

১. আঞ্চলিক হাইড্রোলজি (সাইট পরিদর্শনের মাধ্যমে ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ করা হবে। সিপেজ, জলাবদ্ধতা, গেট অপারেশন, গেট রক্ষণাবেক্ষণ, খালের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি)

সাইট পরিদর্শন তারিখ	সাইট / অবস্থানের নাম	বিষয়	সমস্যা	প্রশমন ব্যবস্থা

২. পানির ব্যবহার এবং গুণমান ব্যবস্থাপনা (সাইট পরিদর্শনের মাধ্যমে ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ করা)

ক) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির মানমাত্রা

পরীক্ষার তারিখ:

সাইট / অবস্থানের নাম:

পরীক্ষার ফলাফল:

প্যারামিটার	একক	সর্বাধিক ঘনত্ব				বাংলাদেশের জাতীয় ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির মানমাত্রা
		স্থান ১	স্থান ২	স্থান ৩	স্থান ৪	
pH						৬.৫-৮.৫
ডিও (দ্রবীভূত অক্সিজেন)	মিঃগ্রাঃ/লিঃ					≥ ৫
বিওডি (বায়ো কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড)	মিঃগ্রাঃ/ লি ঃ					≤ ১০
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	মিঃগ্রাঃ/ লি ঃ					১০

খ) পানির তল পর্যবেক্ষণ

সাইট / অবস্থানের নাম	পানির প্রাপ্যতা (মিটার)

গ) ভূগর্ভস্থ পানির মানমাত্রা

পরীক্ষার তারিখ:

সাইট / অবস্থানের নাম:

পরীক্ষার ফলাফল:

প্যারামিটার	একক	সর্বাধিক ঘনত্ব				বাংলাদেশের জাতীয় ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির মানমাত্রা
		স্থান ১	স্থান ২	স্থান ৩	স্থান ৪	
pH						৬.৫-৮.৫
টারবিডিটি	জেটিইউ					১০
খরতা	মিঃগ্রাঃ/ লি ঃ					২০০-৫০০
লৌহ	মিঃগ্রাঃ/ লি ঃ					০.৩-১.০
নাইট্রেট	মিঃগ্রাঃ/ লি ঃ					১০
আর্সেনিক	মিঃগ্রাঃ/ লি ঃ					০.০৫
কলিফর্ম (সার্বিক)	সংখ্যা/ ১০০ মিলি.					০

ঘ) পানি ব্যবহারের দক্ষতা

সাইট পরিদর্শন তারিখ:

সাইটের বিবরণ:

সমস্যা এবং প্রশমন ব্যবস্থা:

বিষয়	সমস্যা	প্রশমন ব্যবস্থা
পানির ব্যবহারে দ্বন্দ্ব		
ফসল উৎপাদনে দক্ষ পানি ব্যবস্থাপনা		
খামার যন্ত্রপাতি ব্যবহার		

৩. সার ও কীটনাশক প্রয়োগ এবং আইপিএম / আইসিএম গ্রহণ

প্রতিবেদনের সময়কাল:

উপ প্রকল্পের নাম:

গ্রাম / অবস্থান:

ক) সার ব্যবহার

ফসল	জমির পরিমান (হেক্টর)	সার ব্যবহার	কীটনাশক ব্যবহার

খ) আইপিএম/আইসিএম গ্রহণ

গ্রাম / অবস্থান	মোট পানি ব্যবহারকারী গ্রহণকারী	আইসিএম গ্রহণকারী	আইপিএম গ্রহণকারী	যে ফসলের জন্য আইসিএম গৃহীত হয়েছে	যে ফসলের জন্য আইপিএম গৃহীত হয়েছে